## Interview details

Interview with Sraboni Ghosh

Interviewed by Rituparna Datta

ঋতুপর্ণাঃ তুমি ছোটবেলায় তোমার দাদু বা বাড়ির লোকের কাছ থেকে যে দেশের গল্প শুনেছ মানে বাংলাদেশ সেই গল্পগুলো যদি আমাদেরকে বল। মাঝখানে আমি একটু লিখব কিন্তু তুমি বলতে পারো মানে আমি তোমায় বিরক্ত করব না।

শ্রাবণীঃ আচ্ছা দেখ মানে আমি হওয়ার আগে আমার ঠাকুরদা মারা যায়। আমার ঠাকুমা, আমি খুব ছোট তখন ঠাকুমাও মারা যান। ফলে আমার যা স্মৃতি তা সেই স্মৃতিগুলো কিন্ত আমার বাবা মা'র কাছ থেকে। এবার বাবার বাড়ি ঢাকা জেলার কোন্দাতে আর আমার মা হচ্ছেন ঢাকার নারায়ণগঞ্জের। তো বাবারা মানে দাদুর এদের ফ্যামিলিটা বা আমার ঠাকুরদার ফ্যামিলিটা সেটা আর কি আসে ১৯৪৭-৪৮ সালের পর সবাই চলে এসেছিল তার পরে দাদু আবার মানে পরিস্থিতি একটু ভালো হবার পরে কিছু আবার ঠাকুমাকে রেখে আসেন, আবার তার ওখানে কিছুটা ফ্যামিলি ছিলো আর কি। তারপর আস্তে আস্তে যখন ১৯৭১ সাল হয় বা '৭১ সালের গণ্ডগোলের পরে পুরো ফ্যামিলিটাই চলে আসে । ... নানু / মানুদের কথা বলি মানে আমার ঠাকুরদারা তারা চলে আসলেন এখানে এবং আসার ক্ষেত্রে আসাটা খুব একটা সুবিধাজনক হয়নি বা খুব অনুকূল পরিস্থিতে আসতে পারেন নি, যা মানে বাড়িতে যা মানে বাড়ির সমস্ত কিছু ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল একেবারে একবস্ত্রে এবং তখন ওখানে কি হত জান তো মানে ওখানে সেই রাজাকার বাহিনী বা খান সেনা তারা তো হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করত, হিন্দু কেন মুসলিমদের উপরেও তারা অত্যাচার চালাত এবং যে সমস্ত শাসক সম্প্রদায়ের আর কি যারা অনুগত লোকজন ছিলেন তারা আবার খোঁজখবর দিতেন যে এরা পালাচ্ছে বা এরা চলে যাচ্ছেন এদেশ ছেড়ে ওদেশে। তো সেই জন্য দাদু আর কি করলেন ঠাকুরদা আর কি - ঠাকুমা এবং ছোট ছোট যে সন্তানরা তাদের কে পাঠিয়ে দিলেন যে – ঢাকা জেলায় আমার বাবার এক মামা

থাকতেন তো তার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে এরকম বলে তাদেরকে একবস্ত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। পাঠিয়ে দিয়ে তার পরে দাদু পরের দিন বড় যে ... সন্তানরা তাদেরকে নিয়ে যে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছে এরকম প্রিটেন্ড করে বা দেখিয়ে একটা তালা মেরে বাড়িতে চলে আসলেন। তো দাদুকে তারা ধাওয়া করেছিল কিন্তু ধরতে পারে নি। তো তার পরে তারা আগরতলা হয়ে ত্রিপুরা হয়ে – ওই মামা খুব হেল্প করেছিলেন আসতে। তো ত্রিপুরা আগরতলা হয়ে তারা এখানে চলে আসেন। এবারে আর মা চলে এসেছিলো '৬৫-এ আমার যতদূর মনে পরে, '৬৫ নাগাদ বোধহয় বাংলাদেশে কোন একটা কারণে গণ্ডগোল হয়েছিল তো সেটার জন্য মাকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তারপর মা এখানে পড়াশুনা করতেন। মা ওই যেতেন আর কি মাঝে মাঝে যেতেন কিন্তু এ বাদে মায়ের দিকের পুরো পরিবার কিন্তু বাংলাদেশেই থাকেন এবং এখন মানে আমার মামাবাড়ি কিন্তু বাংলাদেশেই আছে। আর এইখানে আমি তো বলছি যে যেটা হচ্ছে '৪৭-'৪৮ সালে থেকে এখানে ছিল একটা অলরেডি আমার ঠাকুরদার যে বাবা মানে তিনি থাকতেন। এখানে এসে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তারপর এখানে কিছু জায়গা-জমি কেনেন এবং বাবার যে পিসিমনি মানে বাবার পিসিমা আমরা পিসিদিদা বলতাম, পিসিদিদা খুব অল্প বয়সে বিধবা হন। মানে ৯ বছরে তিনি বিধবা হন এবং বাবার কাছে ফিরে আসেন, ফলে তার নামে একটা জায়গা কেনা হয়। এই যে বেলেঘাটা আমি যেটা বললাম না ওটা কিন্তু মানে আমার পিসিঠাকুমারই আর কি বাড়ি। তো ওখানে এসেই সবাই ওঠে এবং এইখানে ঠাকুরদা আসার পর ঠাকুরদার সেইরকম কোন জীবিকা ছিল না বা কিছুই করত না, কেউ চিনতও না, কি করবে। ফলে তখন ঠাকুরদা তার বাবাকে বলেন যে তিনি জলপাইগুড়ি চলে যেতে চান কারণ ওখানে কিছু দেশের লোক ছিল আর আগেকার ওরকম হত যে দেশের লোকরা দেশের লোকদের খুব হেল্প করত। (কিন্তু ওই) এখন আছে জলপাইগুড়িতে সাহা নার্সারি ওদের ফ্যামিলিটা আছে। তো এরা আমার ঠাকুরদাকে খুব হেল্প করেছিল। আমার ঠাকুরদা বাংলাদেশে ডাক্তারি করতেন মানে উনি হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক ছিলেন। তো জলপাইগুড়িতে যাওয়ার পরে কালিরহাট বলে একটা জায়গাতে যোগাযোগ করে – তখন তো খুব একটা উন্নত ছিল না, এখন জলপাইগুড়ি বা বিশাল একটা পর্যায়ে চলে গেছে কিন্তু তখন

উন্নত ছিল না এবং ডাক্তারের খুব অভাব ছিল ফলে ঠাকুরদাকে একটা ওই কাঠের ঘর মতন করে দেওয়া হয় এবং ঠাকুরদা ওখানে বসতে শুরু করেন, মেডিক্যাল প্র্যাক্টিস শুরু করেন এবং ওখান থেকে আস্তে আস্তে পরিবারটা আর কি দাঁড়ায়। কিন্তু তদসত্ত্বেও আমি বাবার মুখে যেটা গল্প শুনেছি যে বাবাদেরও খুব কষ্ট করে বড় হতে হয়েছে। যে ছোটবেলার দিনগুলো খুব একটা ভালো কাটে নি। কলেজ পড়ার সময় মানে বাবারা যা পেতেন তাই করতেন আর কি। ওখানে হাট বসত একটা। তো বাবা এবং আমার কাকু এবং জ্যেঠু এরা কি করতেন হাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে কৃষক যারা ছিল তাদের কাছ থেকে আর কি জিনিসপত্র কিনতেন। কৃষকদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনতেন, কম দামে কিনে অপেক্ষাকৃত - কিনে তারপর তারা হাটে নিয়ে এসে বেশি দামে আর কি বিক্রি করতেন। করতে করতে এখন জানো আমাদের একটা দোকান আছে মানে এখন যে জায়গায় আমাদের দোকানটা আছে সেই জায়গায় মানে একটা দোকান আছে জামাকাপড়ের দোকান আছে, দুটো দোকান আছে ইনফ্যাক্ট, ওখানটায় তারা বসতে শুরু করলেন, একটা চট পেতে তার উপর দেশলাই, বিড়ি এই সমস্ত আরো নানারকম জিনিস সাজসরঞ্জামের/সাজ/ সাত-সতেরো... জিনিসপত্র নিয়ে বসতে শুরু করলেন বসে ওগুলো বিক্রি করতেন, হাটে যারা আসত তাদের বিক্রি করতেন। আস্তে আস্তে ওই জায়গাটাকে আর কি একটা ত্রিপল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল, একটা পাথর বা ইট দিয়ে একটা ঘিরে দেওয়া হল, এই করতে করতে আর কি ওই যা হয় আর কি সেরকম তো জীবিকাসন্ধান তো কিছু ছিল না আর কি এইভাবে চলল, চলতে শুরু করল আর কি পরিবারটা। মায়েদের দিক থেকে মা ওই ন-মাসে ছ-মাসে যেত। তারপর মানে মা'রা কিন্তু এখানে এসে কেউ থেকে যায় নি। মায়ের কাকারা ছিল কারণ মা এখানে এসে কিন্তু কাকুদের কাছে থাকত, মানে আমার দাদুরা কাকা ... তাদের কাছে থাকত।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে বললে যে যাওয়া আসা লেগেছিল, এপারবাংলা ওপারবাংলা, এই ব্যাপারগুলো যদি আর একটু বিস্তারিত বলতে পারো। তাদের অনুভূতি বা ফেরত যাওয়ার কোন - কারণ কি হয়েছিল ?

শ্রাবণীঃ ঠাকুরদার দিক থেকে ঠাকুরদা ওদের বা আমার ওদিকের মানে বাবার দিকের ফ্যামিলিরা কিন্তু কেউ ফেরত যায় নি কারণ বুঝেছিল যে আর সম্ভব নয়, কিন্তু আমার দাদুরা ফেরত চলে গেছিল। এবারে দেখ কেন গেছিল সেটা আবার আমিও জানি না সেরকম বিশদ কিছু জানি না, তবে মনে হয় যে ফেলে আসতে পারে নি জানতো মানে অনেকটা মায়েদের দিক থেকে মা'দের একটা বিশাল বাড়ি ছিল বিরাট বাড়ি কিন্তু সেটা ফেলে আসা সম্ভব হয় নি, চলেই গেছে, পরবর্তী কালে গণ্ডগোলের মধ্যেও তারা ওখানে থেকেছে। ফলে তারা হয়ত আর এখানে এসে থাকার কোন চেষ্টা করেন নি যেটা আমার ঠাকুরদারা করেছিলো যে এখানেই একদম চলে এসে থাকা সেটা মায়ের দিক থেকে আর হয়নি, মায়েদের ফ্যামিলিটা আর করেনি।

ঋতুপর্ণাঃ এখন তোমার যে মামাবাড়ি ওখানে রয়েছে তার সাথে কিরকম সম্পর্ক তোমাদের রয়েছে ?

শ্রাবণীঃ হ্যাঁ ওখানেই রয়েছে। আর মা তো বোধহয় মানে দুবছর-তিনবছর অন্তর করে একবার যায়। আমিও অনেকবছর আগে একবার গেছিলাম, আমি তখন ক্লাস ৮-এ পড়ি তখন গেছিলাম। আমি গেছিলাম দেখে এসেছি, দুটোই দেখেছি মানে আমার ঠাকুরদার বাড়িতেও গেছিলাম মানে কোন্দাতেও গেছিলাম, এটাতেও গেছিলাম, এটাতে তো গিয়েছিলামই নারায়ণগঞ্জ এটা, সেখানে ছিলামই। কোন্দাতে যা গল্প শুনেছিলাম বাবাদের কাছে , বাবা যা বলেছিল যে গ্রামটায় ঢোকার মুখে দুটো গাছ আছে বুড়বুড়ির গাছ বলত ওটাকে আর বাবাদের বাড়িটার একদিকে মানে একটা পাকুড়গাছ ছিল আর একদিকে একটা বটগাছ ছিল। তো আমি বটগাছটা দেখেছি কিন্ত পাকুড়গাছটা দেখিনি আর একটা লক্ষ্মী-মণ্ডপ ছিল, মানে লক্ষ্মীর একটা চালাঘর টাইপের ছিল সেটার না ভগ্নাবশেষ দেখেছি। আমাদের যে বাড়িটা এখন সেখানে মুসলিম একজন একটা ফ্যামিলি থাকেন, আমি ক্লাস ৮-এ পড়তে তাই দেখে এসেছিলাম। আর আরেকজন কাকুকে দেখেছিলাম, ওনাকে আমরা গোবিন্দাকাকু বলি। গোবিন্দাকাকুরা ওখানেই থাকতো মানে ওখানেই আছে এখনো। তো এই আর কি। তো দাদুর বাড়ি

তো নারায়ণগঞ্জ, তো দাদুদের শহরের উপরেই আর কি একদম বাড়ি । এখনো ওখানেই আছে, মামারাতো ওখানেই থাকে।

ঋতুপর্ণাঃ এইযো তুমি গল্প শুনেছ আর ওখানে গিয়ে নিজে দেখলে এই যে দুটোকে একসাথে দুটো স্মৃতিকে একসাথে করা সেই অনুভূতি নিয়ে যদি কিছু বল তোমার।

শ্রাবণীঃ দেখ যারা আমার ছোটবেলায় শোনা গল্প আর বড় হওয়ায় গল্পগুলো তো বুঝে বা বোধ তৈরী হওয়াটা না একটু আলাদা। মানে ছোটবেলায় গল্প শুনতাম আর এখন বড় হওয়ার পরে আমি নিজে যখন দেখেছি তাও অনেকদিন হল, তখন সত্যি মানে বাবারা ওই যে কথায় কথায় বলে দেশের বাড়ি দেশের লোক, সত্যি ঋতুপর্ণা, দেখে খুব ভালো লাগল যে সত্যি দেশের বাড়ির যে একটা আমেজ একটা যে টান সেটা কিন্তু আছে। আমরা যখন যাচ্ছি বাবাকে অনেকেই চিনতে পারছে আর আমার বাবার থেকেও যারা বেশি ওখানে চেনা সেটা হচ্ছে আমার জ্যাঠা এবং কাকু তাদের কথা জিজ্ঞেস করছে যে তারা এখন কেমন আছে। আবার একজন মুসলিম চাষীর সাথে দেখা হয়েছিল তিনি আবার বলছেন যে তার ছেলেকে, তার ছেলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তখন আমার ঠাকুরদা তাকে ওষুধ দিয়ে সুস্থ করেছিলেন। তাকে আবার দেখিয়ে বলছে এই আমার ছেলে দেখুন, দেখ দিদিভাই একে আমার/তোমার ঠাকুরদা বাঁচিয়েছিল। তো এই সমস্ত শুনতে শুনতে না সত্যি খুব ভালো লাগে, কোথাও গিয়ে একটা খুব খারাপ লাগে যে ইস! চলে যাওয়া হল এখান থেকে। এতটা প্রসপারাস একটা নদী আছে, একটা খাল - নদী ঠিক বলব না একটা খাল, বাড়িটার সামনে দিয়ে একটা খাল গেছে খুব মায়া লাগে যে হঠাৎ করে একটা দেশ তালা/তারা মেরে রাতারাতি একটা জায়গা ছেড়ে চলে আসা যেখানে একটা সময় আমাদের সমস্ত কিছু ছিলো, সব চেনাপরিচিত মানুষগুলোকে সব ছেড়ে চলে আসা কষ্ট তো লাগেই আর আমারও লাগে তবে হয়ত বাবা মা'র মতন অতটা লাগে না, আমি তো এখানে জন্মেছি, হয়তো অতটা লাগে না, কিন্তু বাবা মা'র তো লাগে কারণ আশ্চর্যজনক

ভাবে দেশ বলতে তারা এখনও বাংলাদেশকেই বোঝে, তাদের ওই জায়গাটাকেই বোঝে, ভারতবর্ষকে ঠিক মেনে নিয়েছে তো বটেই কিন্তু ওই দেশ বলতে গেলে ওখানে বা খুব ইন্টারেস্টিংলি যখন ধর দেশের লোকজন এক হয় আমার মামা মাসিরা এক হয়, বাবাদের/বাবারা সবাই এক হয় যে ভাষাটা বলে সেটা কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভাষা। ছোটবেলায় শুনে ভালো লাগতো এ আবার কি ভাষা বলছে কিন্তু এখন আর মজা লাগে না এখন তো মিস করি যে সত্যি তো এটাতো আমাদের ভাষা আমরা বলতাম এখন এই বোধটা কাজ করে।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে বললে যে যখন ফ্যামিলি গেট টুগেদার হয় তখন নিজেদের মতো করে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করো, এই যে ঘরে একরকমের করছি বাইরে গিয়ে সেটা পাল্টাবার চেষ্টা – এই ব্যাপারটা তুমি যদি আর একটু বিস্তারিত কিছু বলতে পারো?

শ্রাবণীঃ দেখ বিস্তারিত বলতে গেলে মানে এখানটায় আমার যেটা মনে হয় আমার যেটা ইয়ে যে বাইরে বাইরের মতন, অনেকটা সেই চলতি ভাষা আর কথ্য ভাষার মতন ব্যাপার হয়ে যায় বাইরে যখন আসছি তখন এখানকার কোলকাত্তাইয়া ভাষা যেটা সেটাই বলছে কিন্তু যখনই নিজেদের লোকজনেরা আসছে বা বাংলাদেশে যাচ্ছে তখন কিন্তু মানে স্পন্টেনিয়াসলি খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তারা সেই ভাষাগুলোতেই তারা কথা বলছেন, এটা আশ্চর্য লাগছে, যেটা আমরা পারি না। আমাদের প্রজন্মের দখল নেই সেই ভাষাটার আমাদের পূর্ববঙ্গীয় ভাষার দখল নেই। আমাকে বলতে বললে আমি বলতে পারব না কিন্তু তারা বলছেন, মানে অর্থাৎ তাদের ওই রুটটা থেকে গেছে, তারা ওই জায়গাটায় সমানে আর কি তাদেরকে স্মৃতিটা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বা কিছু তো একটা হচ্ছে যে যার জন্য তারা ভুলতে পারছেন না বা ওটাতেই রয়েছেন বা যে রিচুয়ালসগুলো জানতো যে রিচুয়ালসগুলো কিন্তু খুব আলাদা মানে এইখানকার এইপার বাংলার লোকেদের আর ওইপার বাংলার লোকেদের রিচুয়ালসগুলো খুবই আলাদা, অনেক কিছুতে আলাদা। তুমি দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে থেকে শুরু করো

এখানকার লোকেরা আমি জানি না অনেকে কিন্তু লুচি খান আমরা কিন্তু খাই না, এখানে যেমন ধরো সরস্বতী পুজোতে। আমাদের সরস্বতী পুজোয় ইলিশ মাছ খেতে হয় এখানে খায় না, আমাদের পায়েস খেতে হয় এখানে খায় না। আমাদের বিয়েতে জানতো বিয়ের প্রচুর রিচুয়ালস আছে যেগুলো আলাদা। যেমন একটা মজার ঘটনা বলি মানে আমাদের বাড়িতে যে বিয়ে হওয়ার পরে মেয়েকে বিদায় দেওয়া হয় সন্ধ্যেবেলায় কিন্তু এপার/এদেশীদের সকালবেলায় বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়। এই যে রিচুয়ালসগুলো তুমি দেখবে আলাদা। তাছাড়া তো ওই বিখ্যাত ইলিশ-চিংড়ি লড়াই তো আছেই ওটা নাই বা বললাম। এই হচ্ছে কথা। মানে ওই আঁকড়ে থাকাটা কিন্তু আছে রিচুয়ালসগুলোতে।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই রিচুয়ালসগুলো যে এখনো আমরা যে বয়ে বেড়াচ্ছি আমাদের সাথে যে দেশের... রিচুয়ালসগুলো সেগুলো কি মনে হয় যে পরবর্তী প্রজন্মকে সেইগুলো দিচ্ছি না সেইগুলো হারিয়ে যাচ্ছে?

শ্রাবণীঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখ মানে আমরা যদি সেই ভাবে দেখি আমরা তো পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের মধ্যেই কিন্তু আছে বা আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমি কিন্তু চাইব যে তার পর-প্রজন্মকে এটা দিয়ে যেতে কিন্তু কোথাও কি এই একটুতো বোধহয় জানছেনা বা তারা আসলে সরে এসেছে, এখন হয়ত এমন একটা মেন্টালিটি চলে এসেছে যে জেনে আর কি হবে? এখন তো আমরা এখানকারই বাসিন্দা জেনে আর কি করবো? শুধু তাই কেন যেমন ধর আমরা জলপাইগুড়িতে যদি আমি তোমাদের নিয়ে যেতে পারতাম তাহলে দেখতে পারতে যে অনেকটা মানে যে একটা গ্রাম ছেড়ে এসেছে তো বা একটা জায়গা তাদের মাদারল্যান্ড ছেড়ে এসেছেন তো ফলে যে জায়গাটায় তারা এলেন সে জায়গাটাকে তাদের নিজেদের মতন করে নিচ্ছে জানো। আমি দেখেছি, আমার জন্ম জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়িতে আমরা আগে দুবার করে যেতাম বছরে – পুজোর সময় একবার আবার ডিসেম্বরে শীতের ছুটিতে একবার। তো তখন আমি একটু বড় হওয়ার পর এখন রিলেট করতে শিখেছি যে আমাদের

বাড়িটা চারদিকে নারকেল গাছ, সুপুরি গাছ দিয়ে ঘেরা। আমাদের পাশের বাড়িগুলোও তাই এবং খুব আশ্চর্যজনক ভাবে যারা ওপারবাংলা থেকে এসেছে তাদের বাড়িগুলো এরকম। পরবর্তীকালে যখন বড় হয়েছি শঙ্খ ঘোষের একটা বিখ্যাত লেখা আছে জানতো "সুপুরি বনের সারি"। সেটাকে পড়ার পরে আমার এটাকে আরো আমি বুঝতে শিখেছি যে হ্যাঁ! এরা আসার পর যেহেতু খুব সবুজের মধ্যে থাকতো, এদেশে এসে এই দেশটাকে ওই জায়গাটাকে ওরকম করে নিচ্ছে। বা ধর যখন গল্প হয়, আগেকার দিনে সব / সবাই গল্প করে যখন বলত যে 'এ আর কি দেখছিস আমাদের বাড়িতে তো এই হতো, এইরকম প্রসপারিটি ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, গোয়ালের গরু ছিল, এইগুলো শুনতে শুনতে খুব ভালো লাগে – যেটা এখন পাই না মিস করি ।

ঋতুপর্ণাঃ এই যে তুমি বললে যে ছোটবেলায় গল্প বলতে যে বাড়িতে বা বাড়ি কিরকম ছিল বাড়ির চিত্রটা কিরকম ছিল, সেই চিত্রগুলো যদি আরেকটু আমাদেরকে বিস্তারিত বলতে পারো।

শ্রাবণীঃ ওই যে বললাম না বাবার কাছে গল্প করে যে বাবা খুব বাড়িটাকে মিস করে, বাবার কাছে তাঁর দেশের বাড়ির গল্প শোনাগুলো মানেই বাবা বলে যে গ্রাম ঢুকতেই ওই যে বুড়বুড়ির গাছ ছিল, ওই গাছটাকে নমশুদ্ররা পুজো করত এবং বছরে ওরা একটা সময় খুব বড় করে পুজো করে ওইখানে শোলমাছ দিত, শোলমাছ পুড়িয়ে শোলমাছটাকে মানে বেটে আর কি ওরা প্রসাদ তৈরি করত এবং গ্রামে সবাইকে দিত। বাবা ওটা মিস করে। তারপরে গ্রামের যে মানে একসাথে থাকা সবাই এবং বাবার ওই যে আমরা মানে আমাদের মধ্যেও একটা সারাজীবন / সাধারণ ধারণা আছে যে হিন্দু-মুসলিম রায়ট জানতো বাবা আর মা'র মতে ওখানকার যে মুসলিমরা মানে দেশীয় মুসলিমরা ছিলেন তারা কিন্তু খুব ভালো ছিলেন যে ঠাকুমারা / মা'রা বলতেন যে আমার সাথে ওখানকার যে মুসলিম ফ্যামিলিরা ছিলেন ঠাকুমা বা দিদা বলতাম তারা ইয়ার্কি মারত, ফাজলামি মারত, আমাদেরকে রাখত, কারণ ঠাকুমার পক্ষে সম্ভব হতো না কারণ ঠাকুমার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিল,

ফলে তাদেরকে একসাথে দেখা সম্ভব হতো না তো তারা দেখত। এইভাবে একসাথে মিলেমিশে ছিল এবং ওই বটগাছ ওই পাকুড়গাছ ওই যে সামনে দিয়ে চলে যাওয়া খাল এটাকে বাবা ভীষণ মিস করে এবং এখনো সেটাকে বলে। মানে বাবাকে যদি অপশান দেওয়া হয় যে তুমি কি ফিরে যাবে বাবা হয়ত যেতে চাইবে। হয়ত বলছি কারণ এতদিন তো ভারতবর্ষে রইল তো সে ক্ষেত্রে আমার একটু ডাউট আছে কিন্তু বাবা এখনো খুব মিস করে। বাবা কেন মা'ও মিস করে।

ঋতুপর্ণাঃ এই যে দেশভাগ হল, তো দেশভাগের কারণ বা কে করেছে কিসের জন্য করেছে তোমার মা, বাবা বা ঠাকুরদা কাকে রেসপন্সিবল করে?

শ্রাবণীঃ কাকে বলতে স্পেসিফিকালি কিছু সেরকম বলে না, বলে দুজনেই মানে বলে যে দুজনেই রাজনীতির শিকার বা রাজনৈতিক যে দাবা খেলা সেটার শিকার। একটা সিংগল লাইন – র‍্যাডক্লিফের একটা লাইন একটা দেশকে টুকরো করে দিল এবং তারা কিছু ভাবার আগেই তাদের নিজের দেশ নিজের বসতবাটি বা ভিটে যেটাকে বলে সেই ভিটে ছেড়ে, আমার ঠাকুমার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তাঁর স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে তাকে চলে আসতে হল এটা সত্যি বেদনাদায়ক। এটা আর কি রাজনীতি ছাড়া আর কাকেই বা দায়ী করবে বল। এটার ক্ষেত্রে সেরকম স্পেসিফিকালি কিন্তু কাউর সেরকম ভাবে বলে না। এটা বলে যে দেখ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য চলে আসতে হল ।

ঋতুপর্ণাঃ তোমার মা '৬৫ সালে চলে আসেন?

শ্রাবণীঃ হ্যাঁ। মানে ওই '৬৪-'৬৫ এরকম।

ঋতুপর্ণাঃ ওনারা যে '৪৭ এলেন না '৬৫-তে এলেন এই যে এতগুলো বছর ওখানে বড় হওয়া, থাকা সেই স্মৃতিগুলো যদি কিছু বলতে পারো।

শ্রাবণীঃ দেখ মা'কে বোধহয় দাদু '৪৭-এর... '৬৫-তে মা'কে পুরোপুরি পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার আগে বোধহয় মা এখানে আসত। এই পিরিয়ড মানে '৪৭ থেকে '৬৫-র পিরিয়ডটা আমার কাছে অজানা। আমি যতটুকু জানি মা আসেন, মা ক্লাস থ্রি-তে এখানে এসে ভর্তি হয় এবং ভর্তি হওয়ার পরে মা এখানেই পড়াশুনা শুরু করে কারণ মা'র তো ওখানে – যেহেতু মা মেয়ে তাই ওখানে রাখাটা হয়ত সেফ ছিল না। আর আমার আরও দুই মাসি ছিল মানে যখন ওই '৬৫ সালে এক মাসি জন্মায় না, আর এক মাসির বিয়ে হয়ে গেছিল ফলে তাকে আনার কোন প্রশ্নই ছিল না। তো মা'কে এখানে নিয়ে আসা হয়, মা এখানে পড়াশুনা করে তারপরে আশ্চর্য এটাও খুব মজার, এটাও আমি শুনেছি যে দু-বাড়ির ইচ্ছে ছিল মানে বাবাদের দিক থেকেও আর মায়েদের দিক থেকেও দু-বাড়িরই ইচ্ছে ছিল যে বিয়ে হলে বাঙালদের সাথে বিয়ে দেবে মানে এদেশীয়দের মধ্যে বিয়ে দেবে না। ফলে মা'র বিয়েটাও এখানে হয় এবং বাঙালদের সাথেই হয় এবং এটা আরও ইন্টারেস্টিং আমার মা বাবার ইচ্ছে ছিল যে আমাদের মানে আমরা যে প্রজন্ম আমাদের বিয়েটাও বাঙালদের সাথেই দেবে এবং কো ইন্সিডেন্টালি আমারটাও তাই হয়েছে। এটা খুব অদ্ভুত লাগে যে এতগুলো বছর পরেও এখনো ওই ঘটি-বাঙাল এটা কিন্তু সমানে কিন্তু চলে আসছে ...জানি না ।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই ঘটি-বাঙালের পার্থক্যটা যে বলছ, তোমাদের মায়ের মধ্যেও ছিল, মা বাবার প্রজন্মেও ছিল এটা থাকার কারণ কি ?

শ্রাবণীঃ বাবার মধ্যে বেশি ছিল। দেখ আমার যেটা মনে হয়, আমার বোধ থেকে আমি দুটো জিনিস বুঝি – এক তো, একটা বিরাট বড় উদ্বাস্তু যারা চলে আসছেন তাদেরকে যে এইখানে গ্ল্যাডলি মেনে নেওয়াটা সম্ভব ছিল না। কেন সম্ভব ছিল না কারণ দেখ এত একটা চাপ এসে পড়ছে ইকোনমির উপরে, থাকতে দিতে হচ্ছে, এদের সাথে শেয়ার করতে হচ্ছে, এটা হওয়াতে এদের / এপার-বাংলার অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। ফলে বাঙাল মানে 'বাঙাল' মানে কোথাও গিয়ে তাদের মনে হতো যে খুব অবজ্ঞেয় বা এইরকম কেউ। আমার বাবাকে যেমন ফেসও

করতে হয়েছে যেমন কোন বন্ধুর বাড়ি গেছেন, 'ও! তোরা বাঙাল?' আচ্ছা তারপর থেকে তাঁর বাবা মা হয়ত তাঁর সাথে (আমার) বাবার সাথে আর সেরকম কোন ইয়ে করে উঠলেন না। তো বাবার মনে কিন্তু এটা এফেক্ট ফেলেছে। ওই আছে ঘটি-বাঙাল যে নেই ছিল না সেটা বলব না এবং আরও মজার কথা আমি যখন বড় হয়ে এম. এ. পড়ছি যাদবপুরে, আমাদের এটা –এটা কিন্তু নট মানে কিন্তু খুব সিরিয়াসলি নয়, কিন্তু এরকম হতো কলেজ যে এই তোরা বাঙাল, এই তোরা ঘটি, তোরা কিন্তু কিছু জানিস না, তোরা মানেই রান্নায় বিশাল মিষ্টি দিস আর তোরা মানেই রান্নায় বিশাল ঝাল দিস। এই যে মজার মজার এইগুলো কিন্তু আমাদেরকেও / আমিও দেখেছি কিন্তু আমারটা অতটা প্যাথেটিক নয় যতটা আমার বাবার কারণ বাবাকেই এটা দেখতে হয়েছিলো এই ঘটি-বাঙাল মানে বাঙাল আচ্ছা বাঙাল ঠিক আছে সরে দাঁড়ানো। বাবা যেটা বলে যে আগেকার সময় বাঙাল ছেলের সাথে ঘটি মেয়ের বা ঘটি মেয়ের সাথে বাঙাল ছেলের মানে বিয়ে দেওয়াই হতো না সম্ভবই ছিল না ।

ঋতুপর্ণাঃ এই যে তুমি বললে কাকুকে এই যে ঘটি-বাঙাল এই যে বিদ্বেষটা অনেকটাই দেখতে হয়েছে একটু ছোট ছোট ঘটনা যদি একটু বলতে পারো আমাদের।

শ্রাবণীঃ মানে ছোট ছোট ঘটনা বলতে ওই আর কি মানে বাবা হয়ত কোন বন্ধুর সাথে গেছে, সে হয়ত খুব ভালো বন্ধু, বাড়ি যাওয়ার পরেই বাবার তো কথা শুনেই বুঝতে পারত যে এ বাঙাল, জানা গেল সে বাঙাল ব্যস বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে গেল। বাবার ছোটবেলায় এটা মন একটা দাগ কেটে গেল যে 'ও ! আচ্ছা 'আমি বাঙাল বলে আমার সাথে এটা করা হল' এই মানে আর কি ।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে '৪৭ এর পর '৭১-এ যে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল এই সময় তোমাদের বাড়ির লোকের মনোভাব কিরকম ছিল?

শ্রাবণীঃ ভালো তো লেগেইছিল যে বাংলা একটা স্বাধীন বাংলাদেশ হল, কিন্তু তাঁর সাথে বোধহয় কিছুটা দুঃখও ছিল যে আর যাওয়া হবে না এই দেশটায় যেখানে আমরা

ছিলাম, একসময় থাকতাম সেই দেশটায় আর ফিরে যাওয়ার সম্ভব না। বিশেষত আমার ঠাকুরদার দিক দিয়ে সম্ভব ছিল না কারণ তারা এইখানে এবারে থাকতে শুরু করেছিলেন এইখানে আর কি আস্তে আস্তে ডাল পালা আর কি বিস্তার করতে শুরু করেছিলেন। ফলে ফিরে যাওয়ার কথা আর ভাবেননি আমাদের/আমার ঠাকুরদাদার দিক থেকে আর ভাবেননি। যেটা আমার দাদুরা ভেবেছিলেন তারা ফেলে আসতে পারেন নি বা ছেড়ে /ওখান থেকে ছেড়ে আসাটা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেটা এইদিক থেকে কিন্তু হয় নি ।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা আরেকটা আমার যেটা জানতে ইচ্ছে করছে এই যে বললে যে এখনো এখনকার প্রজন্মের মধ্যে খুব হাসি ঠাট্টার মধ্যে চলে এসেছে এই ঘটি-বাঙাল এই ব্যাপারগুলো...

শ্রাবণীঃ হ্যাঁ কারণ সিরিয়াসলি আর নেয় না। সিরিয়াসলি নেয় কি? আমার তো আর মনে হয় না। কেন মানে কি আমি তো এইখানে জন্মেছি আমার কাছে কিন্তু দেশটা বলতে কি এই দেশ। কিন্তু হ্যাঁ কোথাও গিয়ে একটা রুট কাজ করে যে আমার ওখানে কিছু ছিল, বিশেষত দেখে আসার পর তো খুবই মন খারাপ হতো যে ইস! কত ভালো জায়গা ছিলাম গ্রামতো অনেক বড়, আমাদের অনেকটা জায়গা ছিল আমাদের বেশ বিশাল বড় জায়গা ছিল আমাদের। সেই সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে আসা একটা দুঃখ তো কাজ করে। আর ওই যখন মানুষগুলোর সাথে দেখা হচ্ছে যারা আমার দাদুর কথা বলছেন ঠাকুরদা বা বাবার ছোটবেলার কথা বলছেন তখন খুব মায়া লাগছিল যে কেন ছেড়ে চলে যাওয়া হল? না গেলেই হয়ত ভালো হতো। কিন্তু তা বাদ দিয়ে এখনকার পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে আর ফিরে যাওয়ার কথা কিন্তু আর ভাবি না বা আমি ভাবি না।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে তোমার কাছে, এই যে আমাদের 'বর্ডার' পেরিয়ে আসছে, এই 'বর্ডার' তোমার কাছে কি তাৎপর্য রাখে ?

শ্রাবণীঃ আমার কাছে কি তাৎপর্য রাখে! না থাকলেই বোধহয় ভালো হতো। কারণ দেখ একটা বর্ডার বা একটা রেখা সেটা কোন মানুষের মনগুলোকে মানে আলাদা করে দিতে পারে কি? কারণ আমার বাবা মা কে তো দেখছি তারা থাকছেন এদেশে মনের কোন একটা অংশ এদেশে ফিরে আসছে, কোন একটা সত্ত্বা এদেশে ফিরে মানে ফেলে রেখে এসছেন। না থাকলেই বোধয় ভালো হতো। বর্ডার না থেকে যদি আরও বেশি যাতায়াত করা যেত, এত যদি বেড়াজাল না থাকতো, মনে হয় আরও বেশি যেতে পারতাম, আরও বেশি সুবিধা হতো দেখতে পারতাম। ছুঁয়ে ছেনে দেখে আসতে পারতাম আরও।

ঋতুপর্ণাঃ আমার আরেকটু জানতে ইচ্ছে করছে যে মানে এই যে তুমি বললে যে 'বর্ডার' না থাকলেই ভালো হতো কোথাও কি তোমার এটা দেশভাগের সাথেই শুধু মিলাতে ইচ্ছে করে নাকি যেরকম অন্যান্য দেশেও যেমন ইন্ট্যারন্যাশনাল বর্ডার রয়েছে তাঁর সাথে?

শ্রাবণীঃ সবটাই। তাই তো মনে হয়। আমার দিক থেকে তাই তো মনে হয় যে এত বর্ডার এত ইয়ে করে লাভটা লোকের কি হয় আমি জানি না মানে শত্রুতা দিয়ে তো লাভ কিছু হয় না। যে পাকিস্তানের সাথে ভারতের এই যে এত শত্রুতা, বর্ডার এই যে এত ইয়ে পাকিস্তানি ভারতীয়দের মধ্যে না থাকলেই বোধয় ভালো হতো কারণ আদতে তো সবাই একসাথেই একটা সময় থাকত। দেশভাগ হয়ে গেল কি জন্য হল? কি হল? রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে তো আলাদা কিন্তু মানুষের মনগুলো হয়ত চায় না বা সাধারণ মানুষ কি বর্ডার বা তার বর্ডার নয় এরকম বোধহয় বোঝে না। কারণ কি বলছি আমরা যখন / আমি যখন গেছিলাম জানতো মানে যাকেই বলছি সে অটোওয়ালা থেকে শুরু করে রিক্সাওয়ালা, 'ও! আগে আপনারা এখানে থাকতেন? কোথায় থাকতেন? কোথায় দেশ ছিল আপনাদের?' এমনভাবে গল্প করছে আমাদের সাথে যেন সে বহুদিনের চেনা এবং এটা ভাবতে হবে তখন মনে হয় যে সাধারণ মানুষরা এই বর্ডারটা বোঝে না। সাধারণ মানুষের কাছে মানে বাঙালি বা এই হিন্দু-মুসলিমও নয়, বাঙালি এই সেন্সটাই বিশাল বড় এবং বিদেশেও তাই দেখবে

যখন দুজন বাঙালি ...বাঙালিই, তারা সে ভারতবর্ষের বাঙালি না বাংলাদেশের বাঙালি সেটা খুব একটা ম্যাটার করে না। মানে আমি বাইরে গিয়েও মানে বলছি যে যখন গেছি ধরো বাঙালিদের দেখতে দারুন একটা আনন্দ হয়। এই তখন আর মাথায় থকে না যে সে বাংলাদেশ থেকে এসেছে না ভারত থেকে গেছে, না সে হিন্দু না মুসলিম সেটা আর মাথায় থাকে না।

ঋতুপর্ণাঃ তোমার কাছে দেশ কোনটা ?

শ্রাবণীঃ আমার কাছে দেশ অবশ্যই ভারতবর্ষ ।

ঋতুপর্ণাঃ সেটা কি তোমার বাবা মা'র সাথে কোথায় পার্থক্য মনে হয় এই দেশের?

শ্রাবণীঃ দেখ বাবা মা'রা ওখানে জন্মেছেন। তাদের ওখানটার টান থাকাটাই স্বাভাবিক এবং বাবা মা ওখান থেকে যে তাদেরকে তুলে আনা হয়েছে – একটা গাছকে যদি তুলে আনা হয় এমনি যতই তুমি ভালো একটা জায়গাতে পুঁতে দাও তাদের কোথাও কিন্তু রুট ওখানে থাকবে। আমার মন খারাপ হয় আমার খারাপ লাগে, এই যে চলে আসা হয়েছিল ওখানে গেলে ভালো হত যেতে পারতাম কিন্তু আমার / আমি তো আদতে এখানেই জন্মেছি, আমার সমস্ত কিছু এখানেই, আমি তো এখানকার মেয়ে। ফলে আমার কাছে আমার দেশ ভারতবর্ষ। তোমাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দি – ধর বিয়ে হল বিয়ের আগে পর্যন্ত তো আমরা মানে বা.../ পিতৃগৃহে থাকি সেখানাকার একটা যে টান আর তারপরে তুমি যখন শ্বশুরবাড়ি আসছ তারও কিন্তু একটা টান আছে তুমি কিন্তু কোনটাকেই ডিনাই করতে পারবে না এবং দুটোই খুব স্ট্রং। মা বাবার ক্ষেত্রে আমার এটা মনে হয় যে বাবা মা ওটাকে খুব ইয়ে করছেন ওটা ওনার কাছে দেশ বা দ্যাশ কিন্তু এই দেশটা কে তারা ডিনাই করতে পারেন না আর আমি তো পারিই না আমার তো এটাই দেশ।

ঋতুপর্ণাঃ এই যে আসার পরের তুমি যে গল্পগুলো শুনেছ এখান থেকে কীরকম গল্প তুমি তোমার পরের প্রজন্মকে বলতে চাইবে?

শ্রাবণীঃ সবকিছু... সবকিছু বলতে চাই কারণ আমি চাই যে এই যে একটা ধারা... এই ধারাটাকে জানুক পরবর্তী প্রজন্ম। একটা / একদল মানুষ বা একটা পরিবার তার একটা সময়, একটা জায়গায় তার মূল ছিল, তাকে চলে আসতে হল, তার কী স্ট্রাগল ছিল... সেই স্ট্রাগলটাকে সে কি ভাবে বা সেই যে প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলকে সে কি ভাবে কাটিয়ে উঠলেন। অনেক কিছু করতে হয়েছে আমার বাবাকে জ্যেঠুকে অনেক উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়েছে। আমি তো বলছি মানে কিনে পড়াশুনো চালানোর পাশাপাশি যাতে সংসারটা চালিয়ে নেওয়া যায়... অনেক রকম ব্যবসা করেছে বা অনেক কিছু করেছে যাতে উঠে দাঁড়াতে পারে। এই স্ট্রাগলগুলো জানা উচিত কোথাও গিয়ে আমার মনে হয়। ফলে আমি সবটাই জানাতে চাই।

ঋতুপর্ণাঃ এই যে তুমি যে বললে যে বাবাকে তোমার কাকাকে নিজের জীবিকা এবং সংসার চালানোর জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে এই স্ট্রাগলগুলোর গল্প ছোট ছোট গল্প যদি তুমি আমাদেরকে বলত পারো।

শ্রাবণীঃ এই যে তোমাকে আগে বললাম যে পড়াশুনার পাশাপাশি ওরকম হাট থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে বিক্রি করত চাষীদের কাছ থেকে চাল কিনে আনত এনে হাটে এসে বিক্রি করত এরকম আমার ঠাকুমা কিন্তু জানতেন না। বাবা কিন্তু খুব লুকিয়ে লুকিয়ে কাজটা করতেন কারণ ঠাকুমা ভীষন রাশভারি মহিলা ছিলেন। আমার স্মৃতিতেও তাই ঠাকুমা ভীষণ রাশভারি মহিলা ছিলেন, ফলে সেটা জানতেন না এবং বাবারা করতেন। আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করলেন তখন ব্যবসা করতে শুরু করলেন করতে করতে একটা অটো কিনল। আমাদের একটা জান তো আমাদের একটা বিড়ির দোকান ছিল... ফ্যাক্টরি টাইপের ছিল তো তারপরে জামাকাপড়ের দোকান হল, এখনো আছে। তো এইভাবে দাঁড়ালো। তারপরে আমার মেজো-জ্যেঠু চাকরি পেলেন, জ্যেঠু একটা চাকরি পেয়েছিল। মানে পড়াশুনা শেখার

পাশাপাশি আরও কিছু করে যাতে ফ্যামিলিটাকে দাঁড় করানো যায় এটা কিন্তু ছিল বরাবর ছিল ।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে তুমি বলছিলে যে তোমার দেশের বাড়ি মানে বাংলাদেশে যে বাড়ি ছিল ঢাকায় এর এখানের কলকাতা এবং জলপাইগুড়ির বাড়ির মধ্যে যে সাদৃশ্য বা সাদৃশ্য নেই তুমি দেখেছ তো এটার উপরে যদি এর একটু বলতে পার।

শ্রাবণীঃ আমি ঢাকায় গেছিলাম, বা হ্যাঁ, মানে আমি ঢাকায় গেছিলাম তখন বোধয় '৯৮-'৯৯। আমি খুবই ছোটো। আমি বোধয় ক্লাস এইটে পড়ি। ওখান থেকে দেখে ওই পাশ দিয়ে একটা খাল যাচ্ছে, অনেকটা জায়গা, চারদিকে প্রচণ্ড সবুজ। বাড়িগুলো একটু যেরকম হয়, গ্রামের বাড়ি যেরকম গড়পড়তা হয় সেরকম বাড়ি। আর এইখানে এসে আমাদের বেলেঘাটার বাড়ি তো খুবই আর কি ছোট জায়গার উপরে বাড়ি। একদম ইট কাঠ দেওয়া বাড়ি... সবুজের সেরকম ভাবে কিছু নেই তাও ওই মানে বাঙালরা যেখানে থাকবে গাছও থাকবে, তো কিছু গাছপালা আমাদের বাড়িতেও আছে, আর জলপাইগুড়ির যে বাড়ি সেখানে রীতিমত আর কি গাছ লাগানো হয় এবং এটা আমার জ্যেঠুর একটা হবি যে গাছ লাগানো এবং কিছুটা হয়ত আমিও পেয়েছি কারণ আমারও এটা হবি। জ্যেঠু রীতিমত বাড়ির আশেপাশে গাছপালা লাগিয়ে, ওই যে বললাম নারকেল গাছ, সুপারি গাছ মানে প্রচুর ফুল গাছ ফল গাছ, সমস্ত দিয়ে মানে এই কোথাও গিয়ে একটা সাযুজ্য আনার চেষ্টা করে। আগের বাড়িটাকে মিস করে বলে বোধয় কোথাও বাট সাযুজ্য আনার চেষ্টা করে বাড়িটাতে।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে ওখান থেকে আসার পর এই যে ছোট্ট একটা জায়গায় থাকা এবং সেইটা নিয়ে তাদের মনোভাব কিরকম ছিল বা সেরকম কিছু গল্প কি তুমি শুনেছ ?

শ্রাবণীঃ কীরকম গল্প মানে এখানে ভাড়া-বাড়িতে ছিল ঠাকুরদা এসে প্রথমে তারপরে ওই আমার পিসি-ঠাকুমার নামে ওই জায়গাটা কেনা হয় কারণ উনি তো বিধবা ছিলেন, তো ওনার জন্য একটা সংস্থান রেখে যেতে হবে। তো আমার ঠাকুরদা... ঠাকুরদার মেয়ের নামে জায়গাটা কেনেন। কেনার পরে আমার যে ঠাকুরদা এবং তার/আমার বাবা জ্যেঠু এরাও থাকতেন। খুবই ছোটো জায়গায় ছিল, মনঃপূত হত না। তারপরে জলপাইগুড়িতে আমরা যখন মোটামুটি হয়ে যাই, ওই সাহা কাকুদের কথা বলছিলাম যাদের নার্সারি আছে, তারা যখন হেল্প করল তাদের পাশেই আমাদের একটা বাড়ি কেনা হল। আমাদের এখন যে বাড়িটা, এখন আমাদের বাড়িটা কিন্তু অনেকটা জায়গা নিয়ে এবং আস্তে আস্তে জায়গাগুলো কিনতে শুরু করল মানে পরিস্থিতি যত ভালো হয়েছে আর্থিক অবস্থা যত ভালো হয়েছে বাড়িটা তত বার বাড়ানো হয়েছে আর কি কেনা হয়েছে, জমি কেনা হয়েছে আর কি। এখান থেকে আমার যেটা মনে হয় যে ওই ছোট জায়গায় হয়ত থাকতে পারত না, আর কি বড় আরো স্প্যানের দিকে নজর ছিল আর কি। এটা আমার মনে হয়। এজ সাচ বাবার কি মনে হয় ওটা আমি কখনও জিজ্ঞেস করিনি।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে তুমি বললে যে ঠাকুরদারা '৪৭-এর পর অবস্থা যখন আবার ঠিক হয় ফেরত চলে যান। এই যে ফেরত চলে যাওয়ার প্রসেসটায় কেন গেলেন? কি ইচ্ছে ছিল? সেইগুলোকে একটু যদি বল।

শ্রাবণীঃ দেখ তখন যেটা চলে এসেছিল, দেশভাগ হয়েছে, পরিস্থিতি প্রচণ্ড এই দাঙ্গা বা এরকম ছিল বলে চলে এসেছিল। তারপর দুদিকেই পরিস্থিতি থিতিয়ে যায়। এবার বাড়িটার তো ছিলই বা ওখানে লোকজন আর কি দেখত বলে সে চলে এসেছিল। ফিরে চলে যান। ঠাকুমাকে রেখে আসেন। ঠাকুমা না আমার ঠাকুরদা না মানে '৪৭ -এর পরে আমার ঠাকুরদা না মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। ঠাকুরদার বাবা এখানে ওই ভাড়া-বাড়িতে থাকতো আমি যেটা বলছি যে থাকতেন আর কি দুদিকেই আর কি তাল দিয়ে। তো ঠাকুরদা আর কি ওখানে যাতায়াত করতেন। তো ফিরে যান '৪৭-এর পর। মানে '৪৭-এর পর পরিস্থিতি থিতু হওয়ার পরেই আবার ওখানে চলে

যায় । ঠাকুমাকে রেখে আসে। ঠাকুমা ওই দিকটা দেখত আর ঠাকুরদা এইখানে চেষ্টা করত যে যদি আরেকটা / আরেকটু কিছু করা যায় এইখানে। কিন্তু '৭১-র পরে আর সম্ভব হয় নি থাকা ওখানে। পরিস্থিতি হয়তো দাদুর বা ঠাকুরদার মনে হয়েছিলো যে ওখানে আর থাকা যাবে না সেই জন্য চলে এসেছিলো। মানে এ ক্ষেত্রে আর খুব বেশি করে বাবার। বাবাও তখন খুব ছোট জান তো। বাবার তখন বোধহয় দুই কি তিন বছর বয়স। ফলে সেটা আর বাবার মনে নেই। ওইটুকু মনে আছে যে চলে আসে। যেমন বাবা কে নিয়ে... বাবা-তো '৪৭-'৪৮-এর পর চলে যায়। বাবা ওখানে থাকতো এবং বেশি দুষ্টুমি করলে আর কি, বাবা খুব দুষ্টুমি করলে আর কি ঠাকুমা ভয় দেখাতো, "দাঁড়া এবার তোর বাবা আসুক ওইখান থেকে তারপরে তোর মজা দেখাচ্ছি"। এবং বাবাকে নিয়ে আসা হয় ৫২ সালে। কারণ বাবা এইখানে এসে, ওই '৫২-তো, মোটামুটি '৫৫ কি '৫৬ নাগাদ বাবা ক্লাস ফোরের বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিল মানে পরীক্ষা দিয়েছিল বাবার মনে আছে, তার আগের স্মৃতিগুলো বাবার কাছে খুব ধূসর মানে বাবার কাছ থেকে আমার গল্প শোনা। আমিও ঠিক এটার সম্বন্ধে বলতে পারব না।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যো তোমার ঠাকুমা ওখানে ছিলেন, '৭১ সাল অবধি ছিলেন, তো ওনার কিছু ওখানে থাকার যে অভিজ্ঞতা ...

শ্রাবণীঃ অভিজ্ঞতা বলতে ঠাকুমা ভীষণ রাশভারি মহিলা ছিলেন এবং মোটামুটি ঠাকুমা কিন্তু খুব দাপটের সাথে থাকতে পারতেন এবং জানতো মানে ওখানে অনেকে ভয় দেখাতো যে যাতে ঠাকুমা চলে যায় বাড়িটা ছেড়ে দেয়। ঠাকুমাকে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। ঠাকুমা নিজে সেগুলোকে রীতিমত ম্যানেজ করতেন। এমনও গল্প শুনেছি যে রাত্রিবেলায় এসে ভয় দেখাচ্ছে ভূত সেজে ঠাকুমা একটা কাটারি নিয়ে বেড়িয়েছে যে কে ভয় দেখাচ্ছে যে সে ... তাকে আর কি ধরার জন্য। ঠাকুমার ফলে অসুবিধে হয় নি। ওই আশেপাশে বলছিলাম যে গোবিন্দ কাকুরা ছিলেন তারপর মুসলিম যারা ছিলেন অনেকেই তারা ঠাকুমাকে বেশ হেল্প করতেন। ফলে ঠাকুমাকে/ ঠাকুমার সে দিক দিয়ে অসুবিধে হয় নি ওখানে থাকতে কিন্তু '৭১-এর পর তারাই হয়ত মানে

আর ভরসা দিতে পারে নি, যে আর থাকা সম্ভব নয়। কারণ যে খান সেনারা বা রাজাকার বাহিনী তারা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মারছিল। ফলে আর সম্ভব ছিল না ওখানে থাকা। চলে আসতে হয়েছিলো।

ঋতুপর্ণাঃ এই যে '৭১-এরের পরে যে অবস্থাটা পালটাচ্ছে তখন কি ওনাদের নিজেদের কিছু ফেস করতে হয়েছিল?

শ্রাবণীঃ না। এরকম ফেস করতে হয় নি। মানে দাদুকে / ঠাকুরদাকে ওই পাকড়াও করার জন্য মানে ধরতে যাওয়ার চেজটুকু ছাড়া আর সেরকম কিছু করতে হয়নি আমাদেরকে ... চলে এসেছেন। মানে আসাটা খুব স্মুথলি হয়েছিল বা সেরকম কিছু করতে হয়নি।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এবার যে তুমি গল্পগুলো শুনেছ বাবার থেকে এরকম কোন গল্প আছে যেটা তুমি তোমার পরবর্তী প্রজন্মকে বলতে চাও না?

শ্রাবণীঃ না। এরকম কোন গল্প নেই আমি তো বলছি যে আমি সবই বলতে চাই।

ঋতুপর্ণাঃ এই যে বলতে চাইছ এটার কারণটা কী ?

শ্রাবণীঃ এই যে বলছি যে আমার মনে হয় যে একটা মানুষ তার পাস্ট, তাকে জানা খুব জরুরি। কারণ সে যদি না জানে সে তো বুঝবে না তার রুট কোথায়। ফলে আমি তাকে পুরোটাই বলতে চাই এবং আমার সেরকম - সত্যি কথা বলতে আমার বাবার সেরকম তো কোন হার্স মেমারি নেই যেটাকে লুকোতে চাইব বা বলতে চাইব না। ফলে পুরোটাই বলতে চাই। বেশীরভাগই মজার ঠাকুমার ওই যে দাপটের সাথে থাকা বা ঠাকুরদার এখানে এসে যে একটা মেডিক্যাল প্র্যাক্টিস শুরু করা, বাবা – জ্যেঠু এদের পড়াশুনোর পাশাপাশি যে স্ট্রাগল চালিয়ে যাওয়া – এই জিনিসগুলো আমি অবশ্যই বলতে চাই। বা মা'র এইখানে, দেখ আমার মা'র পক্ষে কিন্তু জিনিসটা সহজ

ছিল না। মা তার বাবা মাকে ছেড়ে এখানে থাকত। এখানে থেকে পড়াশুনা করেছে তার কাকাদের কাছে। ফলে এই যে স্মৃতিটা যে একটা ছোট্ট মেয়ে যে ক্লাস থ্রি-তে পড়ে সে তখন তার মা'র কাছে যেতে চাওয়াটাই... এবং মা'র খুব মন খারাপ হত মা যেটা বলত / মা'র মন খারাপ হত, বিশেষত মায়ের জন্য আর কি আমার দিদার জন্য মন খারাপ হত। ফলে এই জিনিসগুলো তো জানানো ভালোই, উচিতই। ফলে আমি সবই জানাতে চাইব।

ঋতুপর্ণাঃ তুমি / তোমার কি মনে হয় যে তুমি যে গল্পগুলো শুনেছ তোমার বাবার যে স্মৃতি আর তোমার মায়ের যে স্মৃতি এর মধ্যে তুমি কি কোন সামঞ্জস্য পাও?

শ্রাবণীঃ দুজনের স্মৃতিতেই ফেলে আসা একটা জায়গার জন্য খুব আকুলতা আর দুজনের স্মৃতিই খুব মানে... মা'র স্মৃতিতে মা যেমন তার পরিবারকে ছেড়ে থাকার একটা কষ্ট ছিল, বাবার স্মৃতিতে আবার তার পরিবারকে পাশে নিয়ে লড়াইয়ের একটা দিক উঠে আসে। মানে একটু উনিশ-বিশ, কিন্তু দুজনের স্মৃতি একটা জায়গায় কমন সেটা হচ্ছে খুব কষ্টের। একটা দেশভাগ, একটা বাচ্চার উপরে, একটা বাচ্চাটা না একটা মানুষের উপরে একটা ছাপ ফেলে গেছে যে ছাপটা তারা এখনো পর্যন্ত বহন করে নিয়ে চলেছে যে কোথাও কষ্টটা তাদের লেগেই আছে।

ঋতুপর্ণাঃ আচ্ছা এই যে তোমার দাদু যে ডাক্তার ছিলেন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার এখানে আসার পর, এই যে কি ভাবে উনি প্র্যাক্টিস শুরু করলেন, এই গল্পগুলো যদি একটু বলো।

শ্রাবণীঃ এই গল্পগুলো মানে ওই কালিরহাটেই একটা ডিসপেন্সারি খুলে দেওয়া হয়। ওখানে দাদু একটা পি. ডব্লু. ডি.-র জায়গা ছিল জানতো ওই পি. ডব্লু. ডি.-র ওই জায়গার উপর দাদুকে কাঠের আর কি একটা দোকান মত করে দেওয়া হয়। তো দাদু আর কি ওইখানে ওই কালিরহাটে... কালিরহাট মানে হচ্ছে আমাদের বাড়িটা হচ্ছে ধুপগুড়িতে। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি জায়গায়, ধুপগুড়ি এখন মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে গেছে তো ওইখানে আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়ির থেকে মোটামুটি কালিরহাট

তিন কিলোমিটার হবে। তো ওখানে দাদুকে একটা জায়গা খুলে দেওয়া, মানে করে দেওয়া হয়। দাদু ওখানে আস্তে আস্তে কোন চিকিৎসক ছিল না, চিকিৎসারও কোন যেহেতু বালাই ছিল না ওখানে ফলে দাদু খুব তাড়াতাড়ি ওখানে সেই জায়গাটা ধরে নিতে পেরেছিল বা উঠে আসতে পেরেছিল। এটা সুবিধা হয়েছিল আর কি বাড়ির।

ঋতুপর্ণাঃ তোমার বাবার এই যে নিজের জীবিকা অর্জন করেছেন, সেটা একটু যদি বলতে পারো, তার যে স্ট্রাগলটা এটা আরেকটু যদি বলতে পারো।

শ্রাবণীঃ বাবার স্ট্রাগলটার সাথে বাবা পড়াশুনা করেছে বি. কম. পর্যন্ত এবং অনেকদিন পর্যন্ত বাবার মানে চাকরি তো সেরকম কিছু ছিল না। চাকরি বাবা সেভাবে চেষ্টাও করে নি। বাবা খুব ছোটবেলা থেকেই ওই স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে করে আর কি ব্যবসার দিকেই আর কি ন্যাকটা ছিল। তো আমার কাছে, বাবার যেটা গল্প শোনা যে আমাদের পাশের বাড়িতে একটা জ্যেঠু ছিলেন সেই জ্যেঠু বাবাকে হাজার দশেক টাকা ... দিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে বাবা প্রথম ওই পি. ডব্লু. ডি., আমার বাবা আর কি ওই পি. ডব্লু. ডি.-র কন্ট্রাক্টর, গভর্নমেন্ট পি. ডব্লু. ডি.-র কন্ট্রাক্টর, আর কি – তো বাবা সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন একজনের সাথে পার্টনারশিপে। এটুকুই আমি জানি। এছাড়া আর তার পরে আস্তে আস্তে বাবার আমি এটাও জানি যে বাবা প্রথম দিকে ওই মেদিনীপুরে গিয়ে কাজ করতেন, জয়নগরে কাজ করতেন। আস্তে আস্তে বাবা দাঁড়িয়ে যায়। বাবার দিক থেকে আর সেরকম কিছু ...

ঋতুপর্ণাঃ এখানে আসার পর বাড়ির মেয়েদের যে পরিস্থিতি ছিল বা সেটার উপর যদি একটু বলতে পারো।

শ্রাবণীঃ বাড়ির মেয়ে মানে একমাত্র তখন ঠাকুমা আর কি এবল আর কি, কারণ পিসিমনিরা খুবই ছোট ছিলেন, দুই পিসিমনি আবার খুবই ছোট ছিলেন ফলে তাদের দিক থেকে আবার তারা কোন সেরকম করে স্ট্রাগল করতে হয়েছে কিনা জানি না। তবে ভাইদের সাথে, ওই আর কি একটা পরিবার দাঁড়াতে গেলে অন্দরমহলের যে

কাজগুলো হয় সেগুলো তারা করত এগুলো, পড়াশুনা বাদ দিয়ে আর বোধহয় জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হয় নি এটুকু বলতে পারি।

ঋতুপর্ণাঃ মানে সংসার চালানোর এই সুবিধা, অসুবিধাগুলো সেটা নিয়ে যদি একটু বলতে পারো?

শ্রাবণীঃ সংসার চালানোর এই সুবিধা অসুবিধাগুলো দেখো একটা প্রতিষ্ঠিত জায়গা ছেড়ে চলে আসা মানে বাংলাদেশে একটা যথেষ্ট আয় ছিল, ধানি জমি ছিল সেখান থেকে আসার পরে এখানে এসে সেইটাতো ছিল না ফলে কিছুটাতো অসুবিধা নিশ্চয়ই ছিল।

ঋতুপর্ণাঃ আরেকটা আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে এই যে তুমি বললে যে রিচুয়ালসগুলোর কথা বলছিলে, এই যে বাঙালদের যে স্পেশাল রিচুয়ালসগুলো ওইগুলো যদি আরেকটু এলাবোরেট করে বল যেগুলো তোমার পরিবারে এখনো চলে আসছে তুমি দেখেছ।

শ্রাবণীঃ ওই যে বলেছিলাম যেটা, ওই যেগুলো বললাম ওইগুলোই, মানে আমি ওইগুলোকেই আর কি ঠিক নোট করেছি আর কি যে অষ্টমীতে আমাদের কোন লুচি খাওয়ার চল নেই আমরা রীতিমত ভাত খাই আর মাছ ঠাছ হয় না। আমাদের জান তো দশমীর দিন একটা যাত্রা বলে একটা অনুষ্ঠান হয় যেটা ওই পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে আর কি ওই ইয়ে দেওয়া হয় আর কি, কি বলব আর কি, পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া হয় আর কি। সন্ধ্যেবেলার দিকে যাত্রা হয় আর দশমীর দিন আমরা নিরামিষ খাই। আর কি বলব বিয়েতে তো বললামই, আমাদের বিয়েতে মেয়েকে রাত্রিবেলার দিকে পাঠানো হয়। আরও বোধহয়, ও ! আমরা তো ঘটিদের বোধহয় একটা শ্রী গড়ার ব্যাপার আছে জানো আমাদের আবার ওটা নেই। আমাদের এই জিনিসটা নেই। এইরকমই ওই দোয়াত... সরস্বতী পুজোতে আমরা অদ্ভুত ভাবে ইলিশ মাছ খাই। এই এরকম রিচুয়ালস আছে।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved